১৮

শ্রমিকের অধিকার

শাহ আলম ফারুক

এই অধ্যায়ে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে পোশাক শিল্প শ্রমিক এবং পাটকল শ্রমিকদের বছরজুড়ে আন্দোলনের বিষয়টি। এ বছর শ্রমিক আন্দোলন এবং ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রমের ক্ষেত্রে জরুরি অবস্থা শিথিলের ঘটনা ঘটে। পরে সম্পূর্ণভাবে তুলে নেয়া হয়।

জরুরি বিধিমালা বলবৎ থাকার কারণে বছরের প্রথম নয় মাস সুস্পষ্টভাবে ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রমের ওপর নিষেধাজ্ঞা বহাল ছিল। উপরন্তু মে ২০০৮-এ নতুন অধ্যাদেশের মাধ্যমে বাংলাদেশ শ্রম আইনে সংশোধনী এনে চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দরে ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রমের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। সেপ্টেম্বর ২০০৮-এ ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রমের ওপর জরুরি বিধিমালা আংশিক শিথিল করা হয়, যা অক্টোবর থেকে কার্যকর করা হয়েছে। ডিসেম্বর মাসে জরুরি অবস্থা তুলে নেয়া হয় এবং এর মাধ্যমে দেশে সভা-সমাবেশ করার মতো সাংবিধানিক অধিকার সম্পূর্ণ ফিরে আসে।

খুলনার বন্ধ করে দেয়া পাটকল থেকে শুরু করে ঢাকা, চট্টগ্রামের পোশাক শিল্প-কারখানার শ্রমিকরা বকেয়া বেতন-ভাতা, নিরাপদ কর্মস্থলসহ উপযুক্ত কর্মক্ষেত্রের দাবিতে সারা বছর আন্দোলন-প্রতিবাদ অব্যাহত রাখে। শ্রমিকদের আন্দোলনের সাথে বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা একাত্মতা প্রকাশ করে। সংস্থাগুলো তুলে ধরে ঝুঁকিপূর্ণ শিল্পকারখানা বিশেষত নির্মাণ, জাহাজ ভাঙা এবং স্টিল মিলের শ্রমিকদের ক্ষেত্রে শ্রম অধিকার লঙ্ঘনের প্রাত্যহিক

বাস্তবতা, যার ফলে ঘটছে কর্মক্ষেত্রে মৃত্যু এবং গুরুতর আহত হচ্ছে শ্রমিকেরা। এই প্রেক্ষিতে আদালত বিদ্যমান আইন অনুযায়ী কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিতের বিষয়ে কর্তৃপক্ষ কেন ব্যর্থ হচ্ছে এ বিষয়ে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের কাছে ব্যাখ্যা জানতে চেয়েছে।

আইনি কাঠামো

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তির অনুমোদন, সংবিধান এবং জাতীয় আইন অনুযায়ী শ্রমিকের অধিকার নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।[১] যদিও এসব আইনের বাস্তব প্রয়োগ নামমাত্র এবং রাষ্ট্রের কিছু অর্থনৈতিক নীতি (যেমন– পাটকল বন্ধ করা) শ্রমিকদের অধিকারকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করছে। নিম্নে আলোচনা থেকে দেখা যাবে, ২০০৮ সালে জরুরি বিধিমালা এবং পুনরায় সংশোধিত শ্রম আইন শ্রমিকের অধিকার বাস্তবায়ন ও নিশ্চয়তার ক্ষেত্রকে অপেক্ষাকৃত দুর্বল করেছে, বিশেষ করে বন্দরগুলোতে।

ট্রেড ইউনিয়নের নিষেধাজ্ঞা শিথিল

৩ সেপ্টেম্বর এক আদেশ জারির মাধ্যমে সরকার জরুরি বিধিমালার অধীনে বলবৎ থাকা শিল্প-কারখানা, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, বন্দর ও কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা কতিপয় শর্তসাপেক্ষে শিথিল করে সীমিত আকারে ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ প্রদান করে।[২]

এর ফলে সিটি করপোরেশনের ক্ষেত্রে পুলিশ কমিশনার এবং অন্যত্র জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের পূর্বানুমতিসাপেক্ষে সিবিএ নির্বাচন[৩] করা যাবে বলে শর্তে উল্লেখ করা হয়। এছাড়া মহানগরের ক্ষেত্রে পুলিশ কমিশনার, অন্যান্য ক্ষেত্রে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা উপজেলা নির্বাহী অফিসারের (ইউএনও) কাছ থেকে কমপক্ষে ৪৮ ঘণ্টা আগে অনুমতি নিয়ে সর্বোচ্চ ১০০ জনকে নিয়ে

---

১ ধারা ১,২,৩,৭ সংরক্ষিত রেখে বাংলাদেশ ১৯৯৮ সালে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কনভেনশন রেটিফাই করে; সংঘে যোগদান এবং সংগঠিত হওয়ার অধিকার সংক্রান্ত আইএলওর ৮৭ নং কনভেনশন, ১৯৪৮; জোরপূর্বক শ্রম বিলুপ্তি সংক্রান্ত আইএলওর ১০৫ নং কনভেনশন, ১৯৫৭ এবং ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম সংক্রান্ত আইএলও কনভেনশন নং ১৮২, ১৯৯৯। এছাড়া বাংলাদেশ ১৯৯০ সালের *কনভেনশন অন দি প্রটেকশন অব দি রাইটস অব অল মাইগ্রেন্ট ওর্য়াকার্স অব দেয়ার ফ্যামিলিজ* দলিলে স্বাক্ষর করেছে, যদিও এখনো রেটিফাই করেনি।

২ ‘*ট্রেড ইউনিয়নিজম অ্যালাউড অন আ লিমিটেড স্কেল*’, *দি ডেইলি স্টার*, ৮ সেপ্টেম্বর ২০০৮।

৩ বিস্তারিত দেখুন : *সমাবেশ এবং সংগঠনের স্বাধীনতা* অধ্যায় ৯।

ট্রেড ইউনিয়নের সভা করা যাবে। তাছাড়া ১০০ জনের ওপর কোনো সভার ক্ষেত্রে উল্লিখিত কর্তৃপক্ষ থেকে পূর্বানুমতি নিতে হবে। ৫০০ বা তদূর্ধ্ব লোকের সভা-সমাবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকবে বলে শর্তাবলিতে উল্লেখ করা হয়। ট্রেড ইউনিয়ন কার্যালয় বা দাপ্তরিকভাবে অনুমোদিত স্থানে অভ্যন্তরীণ সভা করা যাবে বলে পুনঃশিথিল আদেশে বলা হয়। এসব সভার আলোচ্যসূচি শ্রমিক ও সাংগঠনিক ইস্যুতে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে এবং এসব কর্মসূচি বেতার-টেলিভিশনে সরাসরি সম্প্রচার করা যাবে না বলে আদেশে বলা হয়। এ আদেশের মাধ্যমে সভায় এমন কোনো শব্দযন্ত্র ব্যবহার করতে নিষেধ করা হয়, যাতে সভার কার্যক্রমের আওয়াজ বাইরে থেকে শোনা যায়।

কঠোরতর শ্রম আইন

জরুরি বিধিমালা শিথিল করা সত্ত্বেও সরকার প্রধান বন্দরগুলোতে ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রমের ওপর অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে। বলবৎ হওয়ার দুই বছরের মধ্যে শ্রম আইনে দুই দফা[৪] সংশোধনী এনে প্রধান বন্দরগুলোর ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রমের ক্ষেত্রে এই নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়। সংশোধিত শ্রম আইনে চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দরে কেবল একটি ট্রেড ইউনিয়ন থাকবে এবং দুই বন্দরের ২০০ মিটারের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়নের কোনো অফিস স্থাপন করা যাবে না বলে বিধান রাখা হয়। সংশোধিত শ্রম আইনানুযায়ী বন্দর কল্যাণ তহবিলের ৫০ ভাগ অর্থ শ্রমিক কল্যাণ তহবিলে সঞ্চিত হবে। দুই বন্দরেরই ডক ওয়ার্কার্স ম্যানেজমেন্ট বোর্ড বিলুপ্ত করে বন্দর কর্তৃপক্ষকে ঐসব বোর্ডের কর্মকর্তা, কর্মচারীদের আত্তীকরণ করতেও সংশোধিত শ্রম আইনে বিধান করা হয়।[৫]

এ অধ্যাদেশে শ্রম আইন লঙ্ঘনের জন্য শাস্তিও কমানো হয়। শ্রম আইনের ৩০৬ ধারা লঙ্ঘনের জন্য ছয় মাসের পরিবর্তে তিন মাসের দণ্ড নির্ধারণ করা হয়। ৩০৭ ধারা লঙ্ঘনের জন্য তিন মাস কারাদণ্ডের পরিবর্তে ২৫ হাজার

---

৪ ২০০৮ সালের ৮ মে বাংলাদেশ শ্রম আইন (সংশোধন) অধ্যাদেশ ২০০৮ জারি করা হয়।

৫ দেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় আইন সহায়তা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) অভিমত ব্যক্ত করে যে, রাজনৈতিক সংগঠনের সাথে ট্রেড ইউনিয়নের সংশ্লিষ্টতার ওপর প্রস্তাবিত নিষেধাজ্ঞা অসাংবিধানিক এবং সুপারিশ করে যে– এরকম নিষেধাজ্ঞা না রেখে শ্রমিকের অধিকার সংরক্ষণের জন্য শ্রম আইনের সংশোধন করতে পারে। ব্লাস্ট কারখানার ২০০ মিটারের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়নের অফিস স্থাপন না করা সংক্রান্ত বিধানেরও সমালোচনা করে।

পর্যন্ত অর্থদণ্ড রাখা হয়। আগে এ অর্থদণ্ডের পরিণাম ছিল ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত।

কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা

বাংলাদেশ শুধু মৌখিকভাবেই কর্মীদের অধিকার নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি দেয়নি, উপরন্তু অনেকগুলো আইএলও কনভেনশন অনুস্বাক্ষর করে শ্রমিকের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা এবং কর্মপরিবেশের ব্যবস্থা নেয়ার জন্য অঙ্গীকারও করেছে। কিন্তু বাংলাদেশে অকুপেশনাল সেফটি হেলথ এবং এনভায়রনমেন্ট ফাউন্ডেশনের (ওশী) এক প্রতিবেদনে দেখা যায়– কর্মক্ষেত্রে নিহত ও আহতের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এর প্রতিকারের বিষয়টি সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। উদাহরণস্বরূপ, ২০০৮ সালের প্রথম ছয় মাসে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় ১৬৬ জন নিহত হয়েছে। পাশাপাশি কর্মক্ষেত্রে যাওয়া-আসার পথে ২১৪ জন এবং কর্মক্ষেত্র সংশ্লিষ্ট সহিংসতায় (নিয়োগকর্তার নির্যাতন, অপহরণ, দস্যুতা, ছিনতাই, ব্যাটন চার্জ বা পুলিশের গুলি ইত্যাদি) ১৯১ জন শ্রমিক নিহত হয়। ওশীর প্রতিবেদনে সব মিলিয়ে ৯৫৩ জন কর্মীর নানাভাবে[৬] নিহত হওয়ার তথ্য উল্লিখিত হয়। জরিপ প্রতিবেদন অনুসারে, পোশাক শিল্পে মৃত্যুর হার সর্বোচ্চ (৭৮৮ জন), তার পরে আছে পরিবহন খাত (৫৬৬ জন) এবং নির্মাণ শিল্প (১২৩ জন)।

জরিপ প্রতিবেদনে শ্রমিকদের আহত-নিহত হওয়ার জন্য দায়ী করা হয়– যথাযথভাবে শ্রম আইন বাস্তবায়ন না হওয়া, ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে মান্ধাতা আমলের শিল্প অবকাঠামো, অকার্যকর যন্ত্রপাতি, অপর্যাপ্ত নিরাপত্তা সামগ্রী এবং কর্মক্ষেত্রে ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষামূলক সরঞ্জামাদির অপর্যাপ্ততা।

সরকারি ও বেসরকারি কলকারখানার স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়াদি দেখার জন্য সারাদেশে সরকারিভাবে মাত্র ২০ জন কারখানা পরিদর্শক কর্মরত আছেন বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।[৭]

নির্মাণ ক্ষেত্রের কর্মীদের জীবনের অধিকার ব্যাপকভাবে লঙ্ঘিত হওয়ার প্রেক্ষিতে হাইকোর্ট ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০০৮ তারিখে সরকারকে চার সপ্তাহের মধ্যে বাংলাদেশ জাতীয় ইমারত নির্মাণ বিধিমালা ২০০৬ কার্যকর করার জন্য একটি এজেন্সি স্থাপনের জন্য কেন নির্দেশ দেয়া হবে না– এ মর্মে কারণ দর্শাও নোটিশ জারি করেন। হাইকোর্ট ১৫ নভেম্বর ২০০৬ সালে

---

৬ ওশী ২০০৮-এর জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত ১৬টি সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদের ভিত্তিতে এ পরিসংখ্যান প্রস্তুত করে।

৭ বিকাশ কুমার বসাক, 'ইমপ্রুভিং সেফটি অ্যাট ওয়ার্ক প্লেস : রোল অব 'পার্টিসিপেশান কমিটি', *দি ডেইলি স্টার*, ১৯ এপ্রিল ২০০৮।

উপরোক্ত কোড জারি হওয়ার পর নির্মাণ ক্ষেত্রের নিরাপত্তার জন্য কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে সে সম্পর্কে একটা প্রতিবেদন দাখিল করার জন্যও সরকারকে নির্দেশ দেন।[৮] কিন্তু বছরের শেষ পর্যন্ত এক্ষেত্রে কোনো অগ্রগতির তথ্য পাওয়া যায়নি। বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউটের প্রেসিডেন্ট মোবাশ্বের হোসেন, যিনি গণপূর্ত সচিবের নেতৃত্বাধীন নগর উন্নয়ন কমিটির সদস্য, তিনি উক্ত কোড বাস্তবায়ন এবং নির্মাণ ক্ষেত্রের চলমান দুর্ঘটনা রোধে সরকারের অনীহার কথা তুলে ধরেন।[৯]

সারণি ১৮.১ : কারখানা পরিদর্শকের দপ্তরের হিসাব অনুযায়ী ১৯৯৫-২০০৪ আহত ও নিহতের সংখ্যা[১০]

বছর	নিহত	আহত		মোট
		গুরুতর	সাধারণ	
১৯৯৫	১৩	২৮৬	৩,৫৮৭	৩,৮৮৬
১৯৯৬	১১	২৭৬	২,৬০০	২,৮৮৭
১৯৯৭	১৩	৬৩৯	৩,৫৩৯	৪,১৯১
১৯৯৮	২৪	৪২৭	২,৬৫৩	৩,১০৪
১৯৯৯	১১	৪৫৮	১,৭৬১	২,২৩০
২০০০	২১	২৯৮	১,৬২০	১,৯৩৯
২০০১	২৯	২০৫	৮০১	১,০৩৫
২০০২	১৫	১৯৮	১,৮২২	২,০৩৫
২০০৩	১৫	৩৫৭	১,৪২২	১,৭৯৪
২০০৪	১১	২৬৮	৬০৯	৮৮৮
মোট	**১৬৩**	**৩,৪১২**	**২০,৪১৪**	**২৩,৯৮৯**

জাহাজ ভাঙা শিল্পে শ্রমিকদের নিরাপত্তা প্রদানের জন্য হাইকোর্টের নির্দেশনা

হাইকোর্ট ২০০৮ সালের ৭ জানুয়ারি জাহাজ ভাঙা ইয়ার্ডে কর্মরত শ্রমিকদের রক্ষায় পদক্ষেপ গ্রহণ এবং জাহাজ ভাঙা ইয়ার্ডে নিহত ও আহত

---

৮ ব্লাস্ট এবং অন্যান্য বনাম বাংলাদেশ এবং অন্যান্য, রিট আবেদন নম্বর ৭১৮/২০০৮। রিট আবেদনে অভিযোগ করা হয় রাষ্ট্র এজেন্সি স্থাপনে ব্যর্থ হওয়ায় এবং আইন প্রয়োগের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা না নেয়ার কারণে ২০০৭ সালে ৫০ জন নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যু হয়। মামলার প্রতিপক্ষ হিসেবে ছিলেন গৃহায়ন এবং গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়, বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) এবং রিহ্যাব, বাড়ি নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানের একটি সংগঠন।

৯ তৌফিক আলী, 'নো স্টেপ ইয়েট টু এনফোর্স বিল্ডিং কোড', *দি ডেইলি স্টার*, ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৮।

১০ পরিসংখ্যান সেল, কারখানা ও স্থাপনা পরিদর্শন বিভাগ।

শ্রমিকদের যথাযথ ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য কেন নির্দেশ দেয়া হবে না– এ মর্মে তিন সপ্তাহের মধ্যে সরকারকে রিপোর্ট পেশ করতে আদেশ দেন। সেইসাথে ১. জাহাজ ভাঙা ইয়ার্ডে নিহত ও আহত শ্রমিকের সংখ্যা; ২. শ্রমিকদের প্রাণহানি ও ক্ষতির কারণ; ৩. ক্ষতিগ্রস্তদের দেয়া ক্ষতিপূরণের পরিমাণ এবং ৪. এরূপ ক্ষয়ক্ষতি এড়াতে কর্তৃপক্ষের গৃহীত পদক্ষেপ– এই বিষয়গুলোর তথ্য সংবলিত প্রতিবেদন তিন মাসের মধ্যে কোর্টে প্রদান করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়।[১১]

যদিও ক্ষতিপূরণ কর্মক্ষেত্রে আহত ও নিহতদের ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার আইনগতভাবে প্রাপ্ত। কিন্তু অনেকক্ষেত্রেই এ সংক্রান্ত আইনানুসারে বা প্রক্রিয়ায় ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয় না। উদাহরণস্বরূপ, ওশীর (ঙঝঐঊ) তদন্তে পাওয়া যায় জুন ২০০৭ থেকে জুলাই ২০০৮ পর্যন্ত এ সংক্রান্ত ৭০টি কেসের মধ্যে মাত্র একটি ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আইনানুযায়ী মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণের এক লাখ টাকা কোর্টে জমা দেয়া হয়েছে। এছাড়া অনানুষ্ঠানিক ব্যবস্থাতেও শ্রমিকরা কিছু ক্ষতিপূরণ পেয়েছে; আইন অনুযায়ী সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ পেয়েছে ৩৩ জন, ১৪ জন পেয়েছে ৫০ হাজার টাকা, যেখানে প্রকৃত ক্ষতিপূরণ ছিল এক লাখ টাকা, ১৩ জনের ক্ষেত্রে নিয়োগ কর্তা ৫০ হাজারের কম টাকা পরিশোধ করেছে।[১২]

নির্মাণক্ষেত্রে কর্মী নিরাপত্তা

৪ মে ২০০৮ তারিখে র‍্যাংগস ভবনে কর্মরত সিকিউরিটি গার্ড শহীদুল ইসলামের (২২ বছর) কঙ্কাল উদ্ধার করা হয়। ২০০৭ সালের ৮ ডিসেম্বর রাতে র‍্যাংগস ভবন বিধ্বস্ত হওয়ার পর থেকে প্রায় ৫ মাস নিখোঁজ ছিল চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুর থানার হাজীপাড়া গ্রামের আব্দুল সাত্তারের একমাত্র ছেলে শহীদুল। ২২ তলা র‍্যাংগস ভবন বিধ্বস্ত হওয়ার ঘটনায় গার্ড শহীদুলকে নিয়ে মৃতের সংখ্যা দাঁড়ায় ১২।[১৩]

---

১১ বাংলাদেশ পরিবেশ আইনজীবী সমিতির দায়ের করা জনস্বার্থ মামলার প্রেক্ষিতে এ আদেশ দেয়া হয়। এই মামলায় অন্যান্যের মধ্যে কারখানা ও ফ্যাক্টরিস অ্যান্ড এস্টাবলিশমেন্টের প্রধান পরিদর্শক এবং চট্টগ্রামের ডেপুটি কমিশনারকে বিবাদি হিসেবে পক্ষভুক্ত করা হয়। আরও তথ্যের জন্য দেখুন : '*শিপ ব্রেকিং ইন্ডাস্ট্রি : এসসি ইস্যুজ শোকজ নোটিস অন গভ.*', *দি ডেইলি স্টার*, ৮ জানুয়ারি ২০০৮।

১২ সেন্টার ফর কোপারেশন অ্যাকাউন্টেবিলি আয়োজিত ওয়ার্কশপে ওশীর উপস্থাপনা, ব্র্যাক টার্ক সাভার, ৭ আগস্ট ২০০৮।

১৩ শাহ আলম ফারুক, 'র‍্যাংগস ভবনের ধ্বংসস্তূপ থেকে উদ্ধার হলো শহীদুলের লাশ', বুলেটিন, আসক, জুন ২০০৮।

র‍্যাংগস ভবনে দুর্ঘটনার কারণ তথ্যানুসন্ধান ও পরবর্তী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে গঠিত কমিটির প্রতিবেদনকে উদ্ধৃত করে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এক তথ্য বিবরণীতে জানায়– ভবন ভাঙার জন্য গৃহীত পদ্ধতি সঠিক ছিল, 'কংক্রিট শেয়ার বিচ্যুতি'র কারণে দুর্ঘটনা ঘটেছে।[১৪] বিভিন্ন সময়ে হাতুড়ি পেটা করা (হ্যামারিং) ও কম্পনের (ভাইব্রেশনের) কারণে কংক্রিট ধসের সূচনা হয়। প্রতিবেদন থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে মন্ত্রণালয় আরো জানায়, ধসে যাওয়া অংশে কংক্রিটের স্ট্রেংথ ৪ হাজার পিএসআইয়ের স্থলে ২৫শ' পিএসআই (প্রতি বর্গইঞ্চিতে এক পাউন্ড)। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ঐ কমিটির একজন সদস্যের মতে, ভবন ভাঙার কাজ শুরুর আগে সতর্কতামূলক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে রাজউকের ব্যর্থতার কারণে এ ঘটনা ঘটেছে। এদিকে ভবন ধসের মতো ঘটনা ঘটার পরও ভবন ভাঙার জন্য নিয়োজিত বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সিক্স স্টারকে পরে আবারো কন্ট্রাক্ট দেয়া হয়।[১৫]

নির্যাতন ও মৃত্যুর অভিযোগ

৩১ জানুয়ারি ২০০৮ ঢাকায় পেটেক্স ফ্যাশন লিমিটেডের মোঃ খোকন (২৩) নামের এক কর্মীকে হাসপাতালে মৃত ঘোষণা করা হয়। চুরির অভিযোগে সহকর্মী মালেকসহ ধৃত হয়ে ফ্যাক্টরির অভ্যন্তরে ব্যাপক নির্যাতনের পর তাদের হাসপাতালে নেয়া হয়েছিল। ভিকটিমের পরিবারের পক্ষ থেকে একটি মামলা হয় এবং পুলিশ ম্যানেজার নজরুল ইসলাম এবং নিরাপত্তা প্রহরী আবদুর রহিমকে গ্রেফতার করে। ফ্যাক্টরি কর্তৃপক্ষ খোকনের পরিবারকে ৪ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ হিসেবে দিতে সম্মত হয়। বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টারস অ্যাসোসিয়েশন (বিজিএমইএ) এক লাখ টাকা দেবে বলে প্রতিশ্রুতি দেয়।[১৬]

যৌন হয়রানি

---

১৪ *'বিল্ডিং কলাপস : প্রুভ পয়েন্টস অ্যাট র‍্যাংগস কন্সট্রাকশান', দি ডেইলি স্টার*, ১ জানুয়ারি ২০০৮।

১৫ অমিতোষ পাল, *'১১ শ্রমিকের প্রাণহানি সত্ত্বেও ভাঙার কাজে পুরনো ঠিকাদার', সমকাল*, ৭ জানুয়ারি ২০০৮।

১৬. *'আরএমজি ওয়ার্কার বিটেন টু ডেথ ফ্যাক্টরি ম্যানেজমেন্টসিউড', নিউ এজ*, ১ ফেব্রুয়ারি ২০০৮; *'আরএমজি ওয়ার্কার বিটেন টু ডেথ বাই গার্ড, দি ডেইলি স্টার*, ১ ফেব্রুয়ারি *২০০৮*; 'মিরপুরে গার্মেন্টসের ভেতরে শ্রমিককে পিটিয়ে হত্যা : ম্যানেজারসহ দু'জন গ্রেফতার*', সমকাল, ১ ফেব্রুয়ারি* ২০০৮।

নারী শ্রমিকদের হয়রানির অভিযোগে ইমাম ডায়িং অ্যান্ড গার্মেন্টসের জেনারেল ম্যানেজার কামরুল ইসলামের অব্যাহতির দাবিতে শ্রমিকরা ৭ অক্টোবর দিন- ব্যাপী প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করে।[১৭]

স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার অধিকার : মেহেদী হাসান গ্রেফতার

১৫ জানুয়ারি জরুরি আইন ভঙ্গের অভিযোগে মেহেদী হাসান (২৩) নামের এক ব্যক্তিকে জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দারা গ্রেফতার করে।[১৮] মেহেদী হাসান ওয়ার্কার্স রাইট কনসোর্টিয়াম (ডাবলিউ আর সি) নামের একটি বেসরকারি সংস্থার পক্ষে পোশাক কারখানার শ্রম অধিকার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছিলেন। ডাবলিউ আর সি আমেরিকার একটি বেসরকারি সংস্থা, যা বিভিন্ন মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে আন্তর্জাতিক বায়ারদের জন্য প্রণীত কোড অব কনডাক্ট কতটুকু নিশ্চিত করা হচ্ছে, সে বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দিয়ে তথ্য সংগ্রহ করে। আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর হেফাজতে থাকাকালীন মেহেদী হাসানকে তার কোনো আত্মীয়ের সাথে দেখা করতে দেয়া হয়নি। পত্রিকায়, টিভি চ্যানেলে খবর প্রচার করা হয়– সে দোষ স্বীকারমূলক বিবৃতি দিয়েছে। কিন্তু তার পরিবার দাবি করে যে, মেহেদী এমনটি করেনি। পুলিশ অবশেষে মেহেদী হাসানের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের পক্ষে তথ্য-প্রমাণ না পাওয়ায় তার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলায় চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করে।[১৯]

পোশাক শিল্পে সভা-সমিতির অধিকার

২ জানুয়ারি মিরপুরের এস কিউ সোয়েটারস ফ্যাক্টরি বন্ধ ঘোষণার প্রতিবাদে এলাকার ২০টি কারখানার হাজার হাজার শ্রমিক ঢাকার ব্যস্ত সড়ক রোকেয়া সরণি অবরোধ করে রাখে। এর আগে সহকর্মী সালমার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে শ্রমিকরা ২ দিন ধর্মঘট কর্মসূচি পালন করে। প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন পরবর্তী সময়ে ২ জানুয়ারি সকালে কারখানায় কাজ করতে এসে শ্রমিকরা প্রবেশপথে দেখে যে, কর্তৃপক্ষ কারখানা বন্ধ ঘোষণার নোটিশ টাঙ্গিয়ে দিয়েছে। কারখানা বন্ধের কারণ হিসেবে শ্রমিকদের ‘অবৈধ ধর্মঘট’ এবং

---

১৭ ‘সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট : রিমুভাল অব আরএমজি এক্সিকিউটিভ ডিমান্ড’, *দি ডেইলি স্টার*, ৮ অক্টোবর, ২০০৮।

১৮ মামলা নং ১৪(১)০৮, জরুরি বিধিমালার ৩(৪) এবং ৪(৩) ধারা।

১৯ আসক তদন্ত প্রতিবেদন।

‘অফিসিয়ালদের অন্তরীণ করা এবং উৎপাদন ব্যাহত করা’র কথা বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়।[২০]

১২ জানুয়ারি কতিপয় দাবিতে আবারো হাজার হাজার শ্রমিক রোকেয়া সরণি অবরোধ করে। তাদের দাবির মধ্যে ছিল– মাসের প্রথম সপ্তাহে বেতন ও অতিরিক্ত কাজের টাকা পরিশোধ, নাস্তা ভাতা বৃদ্ধি, রাতের বেলায় কাজ করার জন্য রাত্রিকালীন ভাতা, সপ্তাহে একদিন ছুটি, কারণ ছাড়া শ্রমিক ছাঁটাই বন্ধ রাখা। প্রথমে আউটওয়্যার ফ্যাশন, আউটরাইট লিমিটেড এবং আউটফিট ফ্যাশনের শ্রমিকরা রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ জানাতে শুরু করলে এলাকার অন্যান্য কারখানার শ্রমিকরা এসে তাদের সাথে যোগ দেয়। কারখানা কর্তৃপক্ষ, বিজিএমই এবং শ্রমিক প্রতিনিধিদের মধ্যে সমঝোতার ভিত্তিতে ঐদিন বিকেলে অবরোধ প্রত্যাহার করা হয়। ২ ও ৩ জানুয়ারি এসকিউ গার্মেন্টসের শ্রমিকরা তাদের অবরোধ তুলে নেয়।[২১]

জানুয়ারিতে গার্মেন্টস কর্মীদের প্রতিবাদ

ঢাকার মালিবাগে ইসলাম ড্রেসেস লিমিটেডের কর্মীরা মূল বেতনের শতকরা ১০০ ভাগ উৎসব বোনাসের দাবিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করার সময় পুলিশ ও তৈরি পোশাক শিল্পের কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষে ৫০ জন কর্মী এবং ১৪ পুলিশসহ কমপক্ষে ৬৫ জন আহত এবং ১০০-এর বেশি গাড়ি ভাঙ্গচুর হয়। ইসলাম ড্রেসেস লিমিটেড মালিকপক্ষের একজন মূল বেতনের ২৫% হারে

---

২০ *‘ক্লোজার অব আর এম জি ফ্যাক্টরি : ওয়ার্কার্স ডেমো ব্রিংস মিরপুর টু স্ট্যান্ডস্টিল’, দি ডেইলি স্টার*, ৩ জানুয়ারি, ২০০৮। আরো দেখুন : *প্রথম আলো, সমকাল, জনকণ্ঠ*, ৩ জানুয়ারি ২০০৮।

২১ *‘আর এম জি ওয়ার্কার্স ব্লক রোকেয়া সরণি এগইন ফর ওয়েজ : মিরপুর স্ট্যান্ডস্টিল ফর হোল ডে’, দি ডেইলি স্টার*, ১৩ জানুয়ারি, ২০০৮।

বোনাস দেয়া হবে বলে ঘোষণা দেয়। এই ঘোষণার পরে কর্মীরা বিকেল ৩টা ১৫ মিনিটে মালিবাগ ডিআইটি সড়ক অবরোধ করলে পুলিশ তাদের লাঠিপেটা করে এবং সেখানে সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়।[২২]

সারা বছর ধরে পোশাক শিল্পের কর্মীদের প্রতিবাদ কর্মসূচি অব্যাহত থাকে। মিরপুরে প্রথম শুরু হয়ে এই প্রতিবাদ আন্দোলন পরে ঢাকা শহরসহ ইপিজেড, সাভার, কাঁচপুর, কালিয়াকৈর, গাজীপুর ও চট্টগ্রামে ছড়িয়ে পড়ে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে কর্মী ও মালিকপক্ষের মধ্যে সমঝোতার মাধ্যমে সমস্যার নিষ্পত্তি হয়। অন্যান্য ক্ষেত্রে মালিকপক্ষ কর্মী ও তাদের নেতাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা করে। উদাহরণস্বরূপ, ২ থেকে ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত মিরপুর এলাকায় কর্মীদের অসন্তোষের ঘটনাপ্রবাহের সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে ৬টি মামলা দায়ের করা হয়।[২৩]

২০ সেপ্টেম্বর ঢাকায় গার্মেন্টস কর্মীদের মিছিলে পুলিশি নির্যাতন

পাটকল কর্মীদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলন

খুলনা-যশোর শিল্পাঞ্চলের পাটকল কর্মীদের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বছর শুরু হয়। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন পাটকলের অনিয়মিত শ্রমিকরা ৩১ ডিসেম্বর ২০০৭-এর মধ্যে পাঁচ দফা দাবি মানা না হলে ১ জানুয়ারি থেকে

---

২২ সব দৈনিক পত্রিকা দেখুন : বিশেষত ‘মেইহেম অ্যাট মালিবাগ : আর এম জি ওয়ার্কার্স র‍্যানস্যাক ৪০ ভেহিক্যালস ওভার বোনাস হাইক’, *দি ডেইলি স্টার*, ২১ সেপ্টেম্বর ২০০৮।

২৩ আসক তদন্ত প্রতিবেদন।

অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতিতে যাওয়ার ঘোষণা দেয়। এসব দাবির মধ্যে ছিল– সব বকেয়া পাওনা পরিশোধ, চাকরিচ্যুত অনিয়মিত শ্রমিকদের পুনর্বহাল এবং অতিরিক্ত সময়ের কাজের জন্য ভাতা প্রদান। সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে জানা যায়, ৬ জানুয়ারি ২০০৮ অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতি অব্যাহত ছিল এবং ক্রিসেন্ট জুট মিল থেকে স্বেচ্ছা অবসরে যাওয়া ৩৩৩ জন কর্মী ৭ জানুয়ারির মধ্যে তাদের পাওনা পরিশোধ করা না হলে অনির্দিষ্টকালের জন্য অনশন কর্মসচির ঘোষণা দেয়।[২৪]

পাটকল শ্রমিকরা খুলনার খালিশপুরে ১৫ সেপ্টেম্বরে গায়ে আগুন দিয়ে আত্মাহুতি দিতে গেলে দমকল বাহিনী পানি ঢেলে তাদের নিবৃত্ত করে।

খালিশপুর শিল্পাঞ্চলের রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন তিনটি পাটকলের শ্রমিকরা বকেয়া পরিশোধসহ ৮ দফা দাবিতে ২৮ জুলাই অনির্দিষ্টকালের অনশন কর্মসূচি শুরু করে। দাবিগুলোর মধ্যে ছিল– অস্থায়ী শ্রমিকদের জন্য গেট পাস ইস্যু করা, দৈনিক ভিত্তিতে কর্মরতদের মজুরি বৃদ্ধি, মহার্ঘ (মূল্যবৃদ্ধি) ভাতা ২৫ ভাগ বৃদ্ধি করা, অতিরিক্ত সময়ের কাজের জন্য পারিশ্রমিক প্রদান, পাটকলগুলোকে রক্ষার জন্য পর্যাপ্ত অর্থের সংস্থান করা।[২৫]

৮ সেপ্টেম্বর খালিশপুর শিল্পাঞ্চলের প্রায় ৪,০০০ পাটকল শ্রমিক প্রতীকী কফিন বহন ও কাফনের কাপড় পরে বিক্ষোভ সমাবেশ করে এবং তাদের ৮ দফা দাবি মেনে নেয়ার আহ্বান জানায়। ৮ দফার মধ্যে অবশিষ্ট বকেয়া পাওনা পরিশোধ এবং দৈনিক ভিত্তিতে শ্রমিক নিয়োগ বন্ধসহ অন্যান্য দাবি

---

২৪ '*মিট ডিমান্ডস অব খুলনা জুট মিল ওয়ার্কার্স*', *দি ডেইলি স্টার*, ৭ জানুয়ারি, ২০০৮; '*জুট মিলস ওয়ার্কার্স অ্যানাউন্স রেলরোড ব্লকেইড ফ্রম মানডে*', *নিউ এজ*, ৭ জানুয়ারি, ২০০৮।

২৫ '*জুট মিল ওয়ার্কার্স ইন খুলনা : কনটিনিউ হাঙ্গার স্ট্রাইক*', *নিউ এজ*, ২৯ জুলাই ২০০৮।

অন্তর্ভুক্ত ছিল। শ্রমিকরা ঘোষণা দেয়, ১৪ সেপ্টেম্বরের মধ্যে তাদের দাবি মানা না হলে তারা স্বেচ্ছায় আত্মাহুতি কর্মসূচি পালন করবে।[২৬]

১৫ সেপ্টেম্বর ২০০৮ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন পাটকল শ্রমিক উন্নয়ন কমিটি আহূত পূর্ব ঘোষিত আত্মাহুতি কর্মসূচি পুলিশ ভণ্ডুল করে দেয়। ক্রিসেন্ট, স্টার ও প্লাটিনাম পাটকলের ৩০ জন শ্রমিক কাফনের কাপড় পরে এবং মিছিল করে কেরোসিন তেল নিয়ে স্বেচ্ছায় আত্মাহুতির নির্ধারিত স্থান ক্রিসেন্ট জুট মিলের আঙিনার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলে পুলিশ তাদের বাধা দেয়। পরে পুলিশ ও শ্রমিকদের মধ্যে আলোচনার প্রেক্ষিতে ২৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কর্মসূচি স্থগিত করা হয়। পত্রিকার খবর অনুযায়ী, খুলনা অঞ্চলে আন্দোলন প্রশমনের উদ্দেশ্যে শ্রমিকদের বেতন-ভাতার জন্য সরকার ১২৫ মিলিয়ন টাকা বরাদ্দ দেয়। বরাদ্দকৃত এ টাকা ক্রিসেন্ট, প্লাটিনাম, জুবিলী ও স্টার জুট মিলের শ্রমিকদের বেতন-ভাতা, লে-অফ, অবসর এবং হাজিরার জন্য বকেয়া পাওনা বাবদ মোট ৬৮০ মিলিয়ন টাকার চার ভাগের এক ভাগ থেকেও কম।[২৭]

খুলনা-যশোর শিল্পাঞ্চল, চট্টগ্রাম এবং ময়মনসিংহের পাটকল শ্রমিকরা নিজেদের দাবি আদায়ের জন্য সারা বছর ধরে অব্যাহত প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করেছে। খুলনার আলিম জুট মিলের শ্রমিকরা রাজপথ ও রেলপথ অবরোধ করে তাদের আট মাসেরও বেশি সময়ের বকেয়া বেতন-ভাতা পরিশোধ এবং ২২ সেপ্টেম্বর ২০০৭ তারিখে ঘোষিত লে-অফ প্রত্যাহারের দাবি জানায়। ২০০৭-এর জুন এবং জুলাই মাসে তথাকথিত 'স্বেচ্ছা অবসর স্কিমের বাস্তবায়নের আওতায় প্রায় ৩,৭০০ জন শ্রমিক তাদের চাকরি হারায়। শ্রমিকরা তাদের সব প্রাপ্য পাওনা পরিশোধের জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে বারং-বার আবেদন জানায় এবং ফেব্রুয়ারি ২০০৮-এ প্রধান উপদেষ্টা বরাবর ২০০৭ সালের ১৭ এপ্রিল সংঘটিত সংঘাতের[২৮] সূত্রে পুলিশের দায়েরকৃত তিনটি মামলা প্রত্যাহারের আবেদন জানায়।

---

২৬ তাপস কান্তি দাস 'জুট মিল ওয়ার্কার্স প্রিভেনটেড ফ্রম সেল্ফ-ইমোলেশন', *নিউ এইজ,* ১৬ সেপ্টেম্বর ২০০৮।

২৭ শামছুজ্জামান শাহী, 'গায়ে আগুন ধরানো শুধু বাকি ছিল', *প্রথম আলো,* ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০০৮।

২৮ আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) : *হিউম্যান রাইটস ইন বাংলাদেশ-২০০৭*, আসক, ২০০৮।